স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও নারী (চূড়ান্ত খসড়া)

২০২১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আজকের এই কনসালটেশন সভায় যুক্ত থাকার জন্য সি এসও এলায়েন্স এবং আয়োজক সংগঠন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ হতে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২০২০ সাল ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। একই সাথে সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যারা দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছেন। আমরা অভিবাদন জানাই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে এ দেশের আপামর জনগণকে যাদের চরম ত্যাগে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লাল সবুজের পতাকার এই দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ।

পশ্চিম পাকিস্থানের শোষণ ও বঞ্চনা ও '৭১ এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত অর্থনীতি, অপরদিকে হাজার বছরের পশ্চাৎপদ অনুন্নত আধা সামান্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার উত্তরাধিকার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অবহেলায় শাসন-শোষণ বৈষম্যমূলক আচরনের কারনে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি এই দেশের মানুষের জীবনে। অপরদিকে বন্যা, জলোচ্ছ¦াস, খরা, খাদ্যাভাব, প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারনে এই দেশ বিশ্ববাসীর অনুকম্পার পাত্র ছিল। '৭১ এর বাংলাদেশে একটি আধা সামন্তবাদী পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ন সমাজে সব দিক দিয়েই নারীর অবস্থান ছিল প্রান্তিক।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি পশ্চাৎপদ সমাজ ব্যবস্থার দেশ বাংলাদেশ, যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু করেছিল আজ ৫০ বছরে দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হচ্ছে, তা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নারী অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনেতিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। নারীর অধিকার ও

ক্ষমতায়নে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তৈরী পোশাক শিল্পে ২০ লক্ষ নারী শ্রমিকের শ্রম দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কেন্দ্রিক ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব উদ্যম, উদ্যোগের কারণে এবং কৃষিখাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী নীতিমালার কারণে দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছে। আজ কৃষি কাজে অর্ধেকের বেশি নারী কৃষক, কাজ করছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত উক্তি "নারী উন্নয়নের লক্ষ্য নয় বাহক" এ দেশের নারী সমাজ তা প্রমান করেছে। নারীর জীবনেও এই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। নারীর অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিশেষত নারীর অবস্থানের উন্নয়নের পেছনে আছে সচেতন নারীসমাজের অংশগ্রহণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্তগ্রহনে অংশগ্রহনের সুযোগ ও নিশ্চয়তা প্রদানে সরকারী নীতিমালা নারীর এই অংশগ্রহণে সহায়ক হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ যেমন অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে তেমনি নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সূচকেও এগিয়ে আছে।

বাংলাদেশের নারীদের এই উন্নয়নের পিছনে বড় শক্তি '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রচিত দেশে '৭২-এর সংবিধান, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। যা নারী সমাজের প্রাথমিক অর্জন। গত পাঁচ দশক ধরে এই সংবিধান বাস্তবায়নে নারী আন্দোলন সহ বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে জাতীয় এবং বৈশ্বিক শত প্রতিক,লতার মাঝেও অব্যাহত উন্নয়নের ধারার পাশাপাশি নারীর অবস্থানেরও উন্নয়ন হয়েছে। আজ রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ, দুর্যোগ মোকাবিলা থেকে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন সকল ক্ষেত্রেই নারীরা আজ দৃশ্যমান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা, শান্তি মিশনে, সামরিক বাহিনীতে, কুটনৈতিক মিশনে, সাংবাদিকতায়, প্রথাগত- অপ্রথাগত সকল পেশাসহ চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অংশগ্রহণ -বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভ,মিকা রেখেছে। নারীর এই উন্নয়নের পেছনে যেমন রয়েছে গৃহীত সরকারী বিভিন্ন নীতিমালা ও

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও উন্নয়ন সহযোগিতা তেমনি ধারাবাহিক নারী আন্দোলন, এদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, নারী সংগঠনের বহুমাত্রিক অবদান, যারা সংবিদান, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ও আন্তর্জাতিক সমতা ও মানবাধিকারের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৫০ বছরে সংবিধানের সমতার অঙ্গীকার কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

১.শিক্ষা: বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর তালিকাভুক্তির হার ছেলেশিশু থেকে এগিয়ে আছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে নারীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে যে ধরনের প্রনোদনা দেওয়া হচ্ছে যেমন মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা, শতভাগ শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বই প্রদান, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে সুফল বয়ে এনেছে। দেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের মেয়েরা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, গবেষণা, চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। নারী শিক্ষার প্রসার এবং নিরক্ষরতা দুরীকরনে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন যেমন ব্র্যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান সহ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় অনেক সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। নারীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে নারী আন্দোলনেরও ধারাবাহিক সচেতনতামূলক এবং এডভোকেসিমূলক কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

২. স্বাস্থ্য: বর্তমানে নারীর গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় বেশী (নারীর গড় আয়ু ৭৪ বছর বছর ৫ মাস আর পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর ৮ মাস)। শিশু মৃত্যুর হার কমে বর্তমানে প্রতি হাজারে ২৪.৭৩ এবং মাতৃ মৃত্যুর হার কমে প্রতি লাখে ১৭৩ জন হয়েছে। শিশুদের জন্য টিকা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য টিকা প্রদান ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নারীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে বর্তমানে ১.৩৭% হয়েছে। প্রায় ৬২% নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান যে স্বাস্থ্য অবকাঠামো , তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক, যা তৃণমূণ পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৮%

বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের ভূমিকা সামাজিক সূচকের অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছে।

৩. শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ: পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা চেতনাকে প্রতিহত করে লক্ষ লক্ষ নারী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বেও পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে নারীর গতিশীলতাও বাড়ছে। অর্থনৈতিক মূল ধারায় যুক্ত হয়ে নারী অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। তা ছাড়াও নারীরা গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের পাশাপাশি অবৈতনিক কাজ করে চলেছে। দেশের শ্রমশক্তি বছরে ১.৩ মিলিয়ন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার অর্ধেকই নারী শ্রম। সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মরত চলি¬শ লক্ষ শ্রমিকের ৮০% নারী। কৃষিকাজেও নারী কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫০% এর অধিক হয়েছে, যারা ২১ রকমের কৃষিকাজের মধ্যে প্রায় সবগুলোই করে থাকে। গৃহশ্রমিক সহ অনানুষ্ঠানিক সকল পেশাতেই নারীরা কাজ করছে। বৈদেশিক শ্রমবাজারে নারীর আগ্রহ বাড়ছে। বি এম ইটির তথ্যমতে বর্তমানে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের নারী অভিবাসীর সংখ্যা ৬ লক্ষ, ৯৬ হাজার। ক্ষুদ্র মাঝারী ও বৃহৎ উদ্যোক্তা হিসেবে নারীরা অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬% শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শুরু থেকেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

৪. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান দৃশ্যমান। ২০২০ সালের ওর্য়াল্ড ইকোনোমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ সূচকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশে^র মধ্যে সপ্তম। রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষ পদে, সংসদীয় কার্যক্রমে এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব দৃশ্যমান। সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সকল স্তরে (ডিসি, ইউএনও, সিভিল সার্জেন, এসপির মতো সিদ্ধান্তগ্রহনকারী পদগুলোতে) প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কূটনীতিতেও নারীর অংশগ্রহন বাড়ছে। যোগ্যতা আর মেধায় নারী কূটনীতিকরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছেন।

বর্তমানে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেত্রী, ১ জন পূর্ণ মন্ত্রী, ২ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ২২ জন নির্বাচিত নারী সদস্য ও ৫০ জন মনোনীত নারী সাংসদ আছেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানসহ সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীরা অংশগ্রহন করছেন।

স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন ১৩৭১৩ জন। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে আছেন ৪৯৫জন। তাছাড়াও সকল সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কাউন্সিলররা আছেন।

বর্তমানে মোট ৭৮ জন সচিবের মধ্যে ১০ জন নারী সচিব, ৫১১ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে ৮৩ জন নারী অতিরিক্ত সচিব, ৬৩৬ জন যুগ্ম সচিবের মধ্যে ৮১ জন নারী যুগ্ম সচিব।

এছাড়া ৬৪ জনের মধ্যে জেলা প্রশাসক নারী– ৮ জন,নারী রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার– ৭ জন। (তথ্যসূত্র: মার্চ ২০২০ সালের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুযায়ী)।পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রশাসনের উচ্চ পদে পুলিশের মোট জনবলের ৬.৯৬৫% নারী বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত আছেন। তার মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপি ১জন, অতিরিক্ত ডিআইজি ৪ জন, পুলিশ সুপার ৭২ জন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ১০১ জন, এবং সহকারি পুলিশ সুপার ৯৬ জন। তারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন।

১৯৭২ সাল থেকে বিধান অনুযায়ী সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫০টি । ১৯৯৬ সালে ঐতিহাসিক লোকাল গভ: এ্যাক্টের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা এবং এই আসন সমূহ জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা রেখে আইন পাশ হওয়ায় এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এই ব্যবস্থা চালু করায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে নারী আন্দোলন, উন্নয়ন সংগঠন সমূহ নানামুখী কর্মসূচি পালন করে চলেছে।

৫. দারিদ্র্য হ্রাস: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা (দারিদ্র দূরীকরন কৌশল পত্র, সহশ্রাবদ্দ উন্নয়ন লক্ষ্য- এমডিজি, টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্য- এসডিজি) মাধ্যমে দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের (ব্রাক, গ্রামীনব্যাংক, আশা, প্রশিকাসহ, অসংখ্য সংগঠনের) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি নারীর দারিদ্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও বাজেটে তার জন্য বরাদ্দ নারীর দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও দারিদ্র হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন সময় গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে এবং জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল করার মাধ্যমে নারী সমাজকে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য নারী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

৬. খেলাধুলা: ক্রীড়াঙ্গনেও বাংলাদেশের নারীরা আজ পিছিয়ে নেই। প্রচন্ড সামাজিক বাধা দূর করে বাংলাদেশের মেয়েরা দুর্দান্ত দাপটে দৌড়ে বেড়াচ্ছে দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতামূলক নীতির পাশাপাশি সামাজিক বাধা দূর করতে নারী আন্দোলন কাজ করে যাচ্ছে। (আজ জাতীয় নারী ফুটবল দল সাফ অঞ্চলে একবার রানার্সআপ এবং অনুর্ধ্ব ১৬ পর্যায়ে এশিয়ার মধ্যে সেরা আটে উঠেছে দুবার। সাফ গেমস এবং এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নারী ক্রিকেট দল। কাবাডিতে এশিযান পদক নিয়ে এসেছে নারী কাবাডিয়ানরা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারউত্তেলন পর্যায়ে স্বর্ণ জিতেছে এ দেশের মেয়েরা। আরচারিতে এস এ গেমসে তিনটি স্বর্ন পদক জিতেছে বাংলাদেশের তীরন্দাজরা)।

এতো কিছু অর্জনের পরেও নারীর ক্ষতায়নের লক্ষ্যে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ ও করনীয় রয়েছে। বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে সকল শর্ত পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার শর্তাবলী পূরণ করেছে। জিডিপির হার কয়েক বছর ধরে স্থিতিশীল এবং উর্ধমুখী ছিল। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দেশে ৮.১৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ২০১৯-২০২০ এ সাময়িক হিসাব মতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২৪% যেখানে করোনার প্রভাব পড়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে জিডিপির বৃদ্ধির হার আরো

কম লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে বিশে¬ষকরা মনে করেন জিডিপির এই হার আরো বেশি হতে পারতো যদি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দৃঢ় হতো, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ, গৃহস্থালী ও সেবামূলক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হতো।

আবার একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারই উন্নয়নের একমাত্র সূচক হতে পারে না। বিবিএস এর ২০১৯-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দারিদ্রের হার দেখা যায় ২১.৮%। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দলিত হরিজন, আদিবাসী, প্রতিবন্ধি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ কতটা ব্যাপক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভ,মিকা রাখতে পারছে, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, উন্নত মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিচ্ছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কতটা টেকসই বা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে ভ,মিকা রাখছে বা রাখতে পারবে তা নিশ্চিত নয়। তাই বিশেষত নারী ও কন্যাসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে সামগ্রিক অন্তভর্,ক্তিমূলক পরিকল্পনা জরুরী।

উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের হার সীমিত। সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষায় যে ব্যয় হচ্ছে নারী শিক্ষায় সামগ্রিক ব্যয় অপেক্ষা তা অনেক বেশি।

শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব, বিজ্ঞান ভিত্তিক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অসা◌প্রদায়িক সমতাও মানবাদিকারের দৃষ্টিসমন্বলিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদাসীনতা শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে,কারিকুলাম পর্যালোচনা ও সংস্কার না করেই ধর্মভিত্তিক শিক্ষাকে অনুমোদন, সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

সামগ্রিকভাবে নারীর গড় আয়ু বৃদ্ধি পেলেও নারী ও কন্যাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। মেনপত সমস্যা, বয়স্ক নারী, জটিল রোগে আক্রান্ত নারীদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ব্যাহত হচ্ছে। এখনও প্রতিরোধ যোগ্য মাতৃ মৃত্যুও হার শূন্যেও কোটায় আনা সম্ভব হয়নি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রতি মনোযোগ কম। কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও

প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সুরক্ষার বিষয়টি এখনো উপেক্ষিত। শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ওয়াশরুম ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থার মাধ্যমে কিশোরীদের মিনিস্ট্রুয়াল হাইজিন এখনও নিশ্চিত করা হয়নি।

শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত নয় গুনগত পরিবর্তন আনতে না পারলে মৌলিক ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের বৈষম্য কমবে না বা নারীর মানুষ হিসাবে মর্যাদা বা অধিকার নিশ্চিত হবে না। নারী উন্নয়ন তথা সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক বিকাশও হতে হবে। তার প্রধান লক্ষণ আমরা দেখতে পাই নারী ও কন্যার প্রতি অব্যাহত পারিবারিক সহিংসতাসহ নানান ধরনের সহিংসতার হার বৃদ্ধি ও কদর্য নিষ্ঠুর প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এই সহিংসতা প্রতিরোধ বা বন্ধে সমাজের মধ্যে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরোধ হওয়া দরকার, সেটা দেখা যায় না। উপরন্তু সমাজে নারীর প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজ করে বলেই সমাজ নারীর প্রতি সহিংসতাকে একধরনের অনুমোদন দেয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নারীর মানবাধিকারের প্রতি এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সংবেদশীল না, সমতা ও মানবাধিকারের ধারনা স্বচ্ছ না। নারীর জন্য প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, (যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, শারীরিক- মানসিক নির্যাতন, গৃহস্থালী ও সেবামূলক কাজের দায়দায়িত্ব, পারিবারিক সম্পদের অসম বন্টন) পারিবারিক আইনসহ বৈষম্যমূলক অন্যান্য আইন, ধর্মের নামে নানা বিধিনিষেধ ও নারী বিদ্বেষী প্রচার প্রচারণায় প্রতিনিয়ত নারীর মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, গণপরিবহনে, কর্মস্থলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- কোন জায়গায় নারী আজ নিরাপদ না, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকল অবস্থানের সকল বয়সী নারী-কন্যা যৌন নির্যাতনসহ সকল ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারী আন্দোলনের ধারাবাহিক তৎপরতায় নারীর স্বার্থে পারিবারিক সহিংসতা সুরক্ষা ও প্রতিরোধ আইন ২০১১সহ বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হলেও এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হাইকোর্টের অভিযোগ কমিটির গঠনের রায় পাওয়া গেলেও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যারা তার সুফল পাচ্ছেন না। যথাসম্ভব আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না, বিচার প্রাপ্তি অস্বাভাবিক রকমের বিলম্বিত হচ্ছে। বিচারহীনতার সাংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীলদের প্রভাবে অনেক গুরুতর ও বহুল আলোচিত অপরাধের ঘটনারও

প্রকৃত তদন্ত হচ্ছে না এবং বিচারের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। নারী নির্যাতনের প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে ধর্ষণের অপরাধে ২০১৯ মৃত্যুদন্ড ঘোষনা করা হলেও তাতে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অপরাধ সংগঠনে বিরত থাকা বা দ্রুত বিচার প্রাপ্তির মত প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করছেন বিচার কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজ্ঞ জনেরা। নারীর মানবাধিকার মর্যাদা ন্যায়বিচার প্রাপ্তি তথা নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার অভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

এখন পর্যন্ত বাল্য বিয়ের হারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ তালিকায়। আইন থাকলেও কার্যকারিতা নাই। বিশেষ বিধানের মাধ্যমে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ তে’ বিশেষ প্রয়োজনে ১৬ বছরের নিচে বিয়ে দেয়ার অনুমোদন এর মত বিশেষ বিধানের মাধ্যমে সর্ষের মধ্যে ভূত রাখা হয়েছে। বাল্য বিবাহ বন্ধে সমাজ, সরকার, প্রশাসন পরিবার সকলকেই অতিরিক্ত আন্তরিক উদ্যোগী হতে হবে। বাল্য বিবাহ এর যে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া জীবন ঝুঁকি থেকে শুরু করে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাবের ফলে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে একটি হারিয়ে যাওয়া গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

দারিদ্রের হার পূর্বের তুলনায় কমিয়ে আনা সম্ভব হলে ও নারী বহুমূখী দারিদ্রের সম্মুখীন। যারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে সেই শিক্ষা কর্মপযোগী না হওয়ায় এবং পরিকল্পনা না থাকায় তা কর্মসংস্থানে কাজে লাগছে না। যারা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন করছেন, নিজের উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। সেটা উচ্চ শিক্ষিত থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে। শ্রমবাজারে এখনও কর্মক্ষম নারীর প্রবেশগম্যতার হার অনেক কম। ন্যায্য পারিশ্রমিকে শোভন কাজের সুযোগও কম। এখন পর্যন্ত সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি।

প্রশাসনে নারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেক বেশি। পুরুষ সহযোগীদের গৃহস্থালীর কাজের দায়-দায়িত্ব পালনের মানসিকতা এখনও তৈরী হয়নি। পেশাগত কাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পেশাজীবী-কর্মজীবী নারীদের গৃহস্থালী কাজের বোঝা কমানো বা তার অর্থনৈতিক মূল্যায়নে দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ নাই। নারী বিভিন্ন পেশায় কর্মরত হলেও এখনও

গৃহস্থালীর কাজকে সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পন্য বাজারজাতকরণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র, কেন্দ্র স্থাপন, কর্মজীবী নারীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সেরকম কোন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা এখনও একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিরাজ করছে।

বর্তমান সময়ে নারীর উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি অথবা বড় উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ একটি বড় বাধা। কেননা সম্পদ-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে এবং সংসারে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নেই। রাষ্ট্র ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা নীতি গ্রহন করলেও জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ-বের যুগে প্রবেশ করেছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জনশক্তির স্থলে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশি জনশক্তি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হবে। এটা একুশ শতকের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গার্মেন্টস সেক্টরে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ হ্রাস পাওয়া একটি উদ্বেগের বিষয়। প্রযুক্তিতে নারীর প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হলেও ব্যাপক নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করে একটি কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার দুরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগের অভাব রাজনৈতিক দল এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পরিলক্ষিত। রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংসদে নারী আসন সংখ্যা নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে এখনো উপেক্ষিত। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ও নারীর অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি এখন ও গুরুত্বহীন যা কিনা নারীর ক্ষমতায়ন এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্তার জন্য অন্তরায়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যেমন গণতন্ত্র জরুরী তেমনি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

একুশ শতকের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন যার অভিঘাত পরবে বিশেষ করে নারী ও শিশুর উপরে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করতে নারী

সমাজকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ বান্ধব জেন্ডার সংবেদনশীল বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নারীর স্বার্থে বেশ কিছু নীতি, কর্মসূচী গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন (বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, দত্তক এর ক্ষেত্রে) পরিবারে, সমাজে, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার অন্যতম মূল কারণ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। তাছাড়াও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমতা, মর্যাদা ও মানবাধিকারের দৃষ্টি সম্পন্ন আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ না করা, গণমাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, ধর্মীয় সমাবেশে, নির্বিঘেœ নারী বিদ্বেষী অবাধ প্রচার-প্রচারনা, নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখছে।

তাছাড়াও দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও অনেক সময় তা পরিবর্তন করা হয়। যেমন- ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ সালে বাতিল করে পরিবর্তন করা হয়। একসময়ে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলাম নারীর বিরুদ্ধে ১৩ দফা দাবী উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হয়। নারীর মর্যদা ও অধিকারের প্রশ্নেও বিভিন্ন সময় সংবিধান বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনে উদ্যোগ দেখা দেয়। অতি সম্প্রতি নারীর কাজী হবার আবেদন উচ্চ আদালতে নামঞ্জুর এবং প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গার্ড অব অনার দেয়ার ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীর অর্জনকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে এগুলো বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিনিয়তই নারী আন্দোলনকে যার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে নারী সমাজ এগিয়ে গেছে এটাই বাস্তবতা। সময়ের পথ পরিক্রমায় এদেশের লক্ষ কোটি নারী ও কন্যা আজ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। নারী মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে। সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ী, এরোপে¬ন চালানো, প্যারাগ¬াইডিং শুধু নয় পথে-ঘাটে, কৃষিতে, কলকারখানায়, শিক্ষাঙ্গণে, অফিস আদালতে, সরকার পরিচালনায়,সেনা,বিমান,নৌবাহীনি,পুলিশ খেলাধূলায়, রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশ রক্ষায়,জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, সৃজনশীল কর্মকান্ডে, চ্যালেঞ্জিং পেশায়

নারীরা ক্রমাগত তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি অধিকতর দৃশ্যমান করছে। অর্থনৈতিক নানা কর্মকান্ডে তারা যুক্ত হয়ে অর্থনীতির চাকা সচল শুধু নয় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখেছে। জাতিকে করে তুলেছে আত্মবিশ্বাসী। এই যে অর্জন – বিপূল সংখ্যক মেয়ে সাইকেল,মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। এই অর্জনে রয়েছে নারী আন্দোলনসহ সামাজিক আন্দোলন এবং স্যার ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে ব্রাক এবং জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংগঠন সমূহের অসামান্য ভূমিকা। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে প্রত্যক্ষ এবং অগ্রনী ভূমিকা রেখেছে।

নানান সম্ভবনা থাকা সত্বেও আজকের পরিবর্তিত বৈশি^ক এবং জাতীয় বাস্তবতায় যখন সার্বজনিন মানবাধিকার ও মানবতা বিপন্ন, সন্ত্রাস, মৌলবাদ রক্ষনশীলতা, ঘৃনা, সমাজজীবনে রাজনীতিতে প্রধান্য বিস্তার করে চলেছে তখন নারীর উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নীত হচ্ছে নারীর মানবাধিকার নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধওে উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ হ্রাস অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিরাজ করছে। নিশ্চিতভাবে যার অভিঘাত পড়ছে নারী উন্নয়নে নারী আন্দোলনে এই সবই বর্তমান সংকট উত্তরনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমস্যার মুখোমুখী করবে।

বাংলাদেশের এই অর্ধশতাব্দীর যাত্রা পূর্তি বছরব্যাপী উদ্্যাপন এর এই লগ্নে সংবিধান অনুযায়ী সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে বাধাগুলি অতিক্রম করতে রাষ্ট্রকে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে নারী সমাজসহ সকল সামাজিক শক্তিকে হতে হবে অধিকতর সোচ্চার, যুক্ত হতে হবে লক্ষ কোটিতে মূল আন্দোলনের ¯্রাতধারায়। মানবাধিকার ও সম অধিকারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে নারী শুধু অংশীদারই হবে না। বুঝে নেবে নিজের প্রাপ্য অধিকার । অংশগ্রনের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে তার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি গনতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সমতাপূর্ণ মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। দেশ যাবে এগিয়ে।

করোনা অতিমারির জন্য সমগ্র বিশ^ আজ বিপর্যস্ত। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হাড়িয়েছে। অভাবনীয় সংকটে পরেছে কোটি কোটি মানুষ। গত দেড়

বছরে এই সংকট বিস্তৃত হয়েছে অর্থনৈতিক সামাজিক সংকটে। দেশ, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণী, বয়স, লিঙ্গ জাতিগত নির্বিশেষে বিদ্যমান বৈষম্য, জেন্ডার অসমতা কাঠামোগত সংকটকে গভীরতর করেছে। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা গবেষনা তথ্য থেকে এটা স্বীকৃত যে, যে কোন সংকট কালীন সময়ে নারীরা অধিক মাত্রায় অভিঘাতের মুখোমুখী হয় তাই করোনার অতিমারীর আগে নারী পুরুষের সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি হয়েছিল তা আজ গভীর চ্যালেঞ্জের মুখে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ:

- করোনার অভিঘাত মোকাবেলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনাতে নারীর প্রতি অভিঘাতসমূহকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- অভিঘাত চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নারী সমাজের মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহন করতে হবে।
- কোভিড সংকট মোকাবেলায় নারীর উপরে কোভিডের অভিঘাত মোকাবেলার কর্মকৌশল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং জেন্ডার বাজেটের তার প্রতিফলন থাকতে হবে।
- জাতীয় এবং স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহন এবং বাস্তাবায়নে নারী নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল কর্মসূচী জোরদার ও অব্যাহত রাখতে হবে এবং সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল ধরনের বৈষম্য নিরসণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি গণতান্ত্রিক, অসম্প্রদায়িক, সমতা ভিত্তিক, মানবিক, বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ প্রদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ৫০ বছরে নারী আন্দোলন সামাজিক শক্তি উন্নয়ন সংগঠনে ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে আগামীতেও সরকারি বেসরকারি কার্যকর সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।